আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আহমেদ ঈসা
ওসমান আলি

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন
রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

STUDIES IN ISLAMIC CIVILIZATION
The Muslim Contribution to the Renaissance

A compelling attempt to restore the historical truths of a "golden age" that ushered in the Islamic renaissance, and as a by-product that of the West. Islam created a civilization that changed the world for the better. Spanning a greater geographic area than any other, across the eastern hemisphere from Spain and North Africa to the Middle East and Asia, it formed a continuum between the Classical world and the European Renaissance.

AHMED ESSA *with* OTHMAN ALI

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন

রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

মূল

আহমেদ ঈসা ও ওসমান আলি

সংক্ষেপণ

এলিসন লেক

বাংলা অনুবাদ

ড. এম আবদুল আজিজ

সম্পাদনা

আহমদ হোসেন মানিক

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন

রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

আহমেদ ঈসা ও ওসমান আলি

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৭৩১-৭-০

Bengali version of *'Studies In Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance'*. published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100, E-mail: biitpublications@gmail.com; publication: Sep. 2023 Price: Tk 125.00

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আইআইআইটি'র প্রধান প্রধান প্রকাশনার সংক্ষিপ্তরূপ IIIT Books-in-Brief সিরিজের প্রকাশনা কার্যক্রম। পাঠকদেরকে প্রকাশনার বিষয়সমূহের চুম্বক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম। সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য ও সময়সাশ্রয়ী পাঠ হিসেবে পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় করতে বড় বড় প্রকাশনার লেখাগুলোর সারসংক্ষেপ এ গ্রন্থে সযত্নে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে পাঠকগণ মূল প্রকাশনার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance গ্রন্থটি ২০১০ সালে বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হয় এবং ২০১১ সালে এটির পুনর্মুদ্রণ হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম স্কলারদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং আন্দাজ করা যায় যে, মুসলিম স্কলারদের ব্যাপক অবদান ছাড়া ইউরোপে রেনেসাঁ সম্ভব হতো না। প্রায় হাজার বছর ধরে বিশ্বসভ্যতায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল ইসলাম; যার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে ছিল অনেক বিশাল। ইসলাম জাতি ও শ্রেণির মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে। ইসলাম ঠিক করে দিয়েছে নীতি ও আদর্শের মধ্যে থেকে মানুষ দুনিয়ার প্রাচুর্যসমূহ উপভোগ করবে। মুসলিমরা হারিয়ে ফেলা জ্ঞানগরিমা পুনরুদ্ধার করবেন। চিরদিনের জন্য না হলেও অন্তত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরা তা রক্ষা করবেন।

মুসলিম স্কলারগণই ইউরোপে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে শাণিত করেছিলেন; সাতশত বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপের ভাষাকে তারা প্রভাবিত করে রেখেছিলেন। তখন আরবি ছিল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ভাষা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ভাষার ঐতিহ্যকে কোনো একসময় একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে, আর কাল-পরিক্রমায় এ-ভাষা অতলে

তলিয়ে গেছে। এলডাস হাক্সলির ভাষায়, 'সত্য মহান তবে বাস্তবতার নিরিখে এর চেয়েও মহান হলো সত্য সম্পর্কে নীরব থাকা। সাধারণ অর্থে বিশেষ কোনো বিষয়ের নাম উল্লেখ না করেই ... প্রচারকরা তখন সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী ও অনেক বেশি কার্যকরভাবে বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল'।

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন : রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান গ্রন্থটি ভ্রান্তির এরূপ অপচেষ্টাকে অপনোদনের জোর প্রয়াস। এতে ইসলামের ইতিহাসের সেই 'সোনালি যুগকে' সত্যের তাগিদে পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে; যার মাধ্যমে পশ্চিমাদের কার্যকারণের ফলে ইসলামী রেনেসাঁর উদ্ভব হয়েছে। খানিক চোখ বুলালেই দেখা যায় এটি হলো সংস্কৃতির অবদান, এ সংস্কৃতিকে এভাবে মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির মডেল হিসেবে মনে করা হয়।

মূল বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন: রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান

আহমেদ ঈসা ও ওসমান আলি

সূচি

সূচনা

বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ এবং একটি বিশ্বাসের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে ইসলাম বিরাট ভূমিকা রাখে। অন্য কোনো সভ্যতার চেয়ে বিশাল এলাকাজুড়ে পূর্ব গোলার্ধ থেকে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া পর্যন্ত এলাকাজুড়ে ক্লাসিক্যাল বিশ্ব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁর মধ্যে ইসলাম একটি যোগসূত্র রচনা করেছে। আশ্চর্যজনক হলেও মুসলিম সমাজকে আজ পশ্চাৎমুখী সংস্কৃতি হিসেবে দেখা হয়। জনপ্রিয় ঐতিহাসিক বিবরণ নথিভূক্ত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন যা প্রমাণ করে যে ইসলামী সভ্যতায় অনন্য উচ্চতায় ছিল মানুষের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মডেল।

অনেক গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতাকে একেবারে জটিল করে দেখানো হয়েছে, না হয় ইসলামের অবদানকে না দেখার ভান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সেই ভুলকে অপনোদন করা হয়েছে, ইসলামী রেনেসাঁর সোনালি যুগের সত্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিল্প-সংস্কৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে তুলে আনা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে বিরাট পরিসরে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মীয় ও মানবিক বিষয়ের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগরিমার বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয়েছে। মুসলিম প্রেক্ষাপটে আলোচনার সাথে সাথে পশ্চিমা পণ্ডিতদের অবদান সম্পর্কিত আলোচনাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বিশ্ব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইসলামী সভ্যতার অর্জন এবং ইতিবাচক অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। প্রাসঙ্গিক গবেষণার অভাব, মুসলিম বিশ্বের অনুপ্রেরণাদায়ক বর্তমান অবস্থা এবং পশ্চিমা একাডেমিক বয়ানে ইউরোকেন্দ্রিক পদ্ধতির দ্বারা এই তদারকির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা সংক্রান্ত গবেষণা দু'টি ধারায় বিভক্ত। প্রথমত, বর্তমান শিক্ষাজগতের আলোচনায় মধ্যযুগীয় সভ্যতা বিকাশে ইসলামের অসাধারণ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার অবদানও স্বীকার করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশে মুসলিম অবদানের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এ সময়ের স্কলারগণ বস্তুনিষ্ঠ ও কষ্টকর মাঠকর্মে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে তারা মধ্যযুগীয় ইসলামের বিপুলসংখ্যক সম্পদের আবিষ্কার করেন। এ সময়ের স্কলারগণের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, রেনেসাঁ ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার কাছে স্বীকৃত পরিমাণের চেয়েও বেশি ঋণী ছিল। ইসলাম কোনো ধর্মান্ধ বিষয় ছিল না বা অমুসলিমদের কাছে আচার-আচরণের দিক দিয়ে কোনোরকমের অসহিষ্ণু বিষয় ছিল না।

এরপরও দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ পশ্চিমা পণ্ডিতদের একাংশ ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার কারণে ইসলাম সম্পর্কে বৈরীমত প্রকাশ করে। এ প্রভাবশালী চক্রটি সাধারণভাবেই সমগ্র ইতিহাসে ইসলামী সভ্যতার সৃজনশীলতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে অবমূল্যায়নের দৃষ্টিতে দেখে। ইসলাম ও এর সভ্যতার এরূপ ধারণার মধ্য দিয়ে তারা মনে করে যে, ইসলামের ইতিহাস ও এর সভ্যতার মধ্যে ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস ও ধর্মযুদ্ধ ছাড়া কিছুই নেই। তাদের ধারণা সহিষ্ণু ইসলাম বলতে কিছু নেই।

এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ইসলামী সভ্যতার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো বর্ণনার সাথে সাথে কীভাবে ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং দেশের বিধিবিধান হিসেবে ইসলাম অন্যান্যের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করেছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগে ইসলামী সমাজ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে, অমুসলিমদের অবদানকে মুসলিমরা গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবদান থেকে তারা মুক্তভাবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে মুসলিমরা একটি প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা করেছেন। ■

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার মধ্যে একটি অসাধারণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। মুসলিম স্কলারগণ শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত হারানো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উদ্ধার করেছেন আর সবসময়ে তাঁরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছেন। এরূপ বিশাল সৃজনশীলতার মধ্যে মুসলিমরা বহু শতাব্দী ধরে তাদের নিজস্ব অবদান রেখে চলেছেন। জ্ঞানের অন্বেষণকে মুসলিমরা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন। এ অবদান ধর্মের অসাধারণ গুণাবলি থেকে উৎসারিত হয়েছে, মুসলিমদের এ অবদান মানবজাতিকে মর্যাদা প্রদান করেছে।

দুনিয়ার সম্পদরাজিকে মানুষ নৈতিক ও আদর্শগত গণ্ডির মধ্যে থেকে ভোগ করবে ইসলাম এটি ঠিক করে দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতির মধ্যে ভেদাভেদকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী সভ্যতা ভৌগোলিক ও জাগতিক সীমানার বাইরে এসে ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এভাবেই ইসলাম বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। সমাজে নারীরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইসলামী সভ্যতার সব অর্জন ও প্রভাবের পেছনে রয়েছে ইসলামী জীবনধারায় জীবনযাপন।

হাজার বছর ধরে ইসলাম বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী সভ্যতার মধ্যে একটি সভ্যতা। এ-সভ্যতায় আরবি ভাষা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল।[১] এরপরও ইসলামী সভ্যতার অন্য সভ্যতার কাছ থেকে গৃহীত অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বহু ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক ইউরোপের ওপর গুরুত্ব দেয়ায় মধ্যযুগীয় সভ্যতাকে একমাত্র সভ্যতা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[২] তাদের ঐতিহাসিক বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে সপ্তম শতাব্দী থেকে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব বর্ণনায় ইসলাম, কুরআন ও রাসূল সা.-কে আক্রমণ করা

হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ গ্রিস, রোম, খ্রিষ্টধর্মের দ্রুত উন্নয়নের বিষয়, ইসলামী জমানার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং রেনেসাঁর ওপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

মুসলিমগণ পূর্ববর্তী সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন, একইভাবে অমুসলিমরাও মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। এরপরই মুসলিমরা তাদের অবদান রাখতে থাকেন। আর এভাবেই তারা অসাধারণ একটি সভ্যতা গড়ে তোলেন। এর বিনিময়ে অন্য সভ্যতা বিশেষ করে উদীয়মান ইউরোপের সভ্যতা ইসলামী সভ্যতা থেকে ধ্যান-ধারণা ও বস্তুগত সহযোগিতা গ্রহণ করেছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বিকাশের পরিপূরক করে আরেকটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে ইসলাম এবং পরবর্তীতে প্রভাবশালী পশ্চিমা সভ্যতারও ভিত্তি প্রদান করেছে। ■

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতা ও শিক্ষণ

শিক্ষণের[৩] ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সপ্তম শতাব্দীর বিশ্বে যে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল, ইসলাম তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রধান প্রধান সভ্যতা এ-সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ-সময়ে ইউরোপের অবস্থান ছিল অন্ধকার যুগে। ইসলামের ভৌগোলিক সম্প্রসারণের সাথে সাথে ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আনুকূল্যও লাভ করেছিল।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে কুরআন একটি বিরাট প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ইলম (জ্ঞান) শব্দটি কুরআনের ৭৫০ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দগুলোর মধ্যে এটি একটি শব্দ। মুহাম্মদ সা.-এর হাদিসেও এ শব্দটি বারবার এসেছে। শুধু তাই নয়, অন্য সব সৃষ্টির থেকে বিচারবুদ্ধির জন্য আল্লাহ মানুষকে আলাদা করে দিয়েছেন।[৪] বৈজ্ঞানিক ধারণা বর্ণনায় এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কুরআনের ভাষা অনেক সমৃদ্ধশালী। কুরআনের ভাষা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। এটি হৃদয়গ্রাহী, মন চায় বারবার তিলাওয়াত করতে। একজন মুসলিম সারাজীবনই কুরআন তিলাওয়াত শোনে।

ক্ল্যাসিক্যাল আরবি ভাষার অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি অর্থাৎ ইসলামের ভাষার বিষয়টি ও সভ্যতার ওপর ইসলামের প্রভাবের বিষয়টির ওপর বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পশ্চিমারা এটিকে যেভাবে গ্রহণ করেছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ইউরোপের মধ্যযুগের সময়ে আরবি ভাষা মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং ইউরোপেও এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। ল্যাটিন ভাষা আসার পূর্বে কোনো কোনো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও আরবি ভাষা ব্যবহৃত হতো। মৌলিক অভিধান ও আরবি ব্যাকরণ ইহুদিদর্শনের পক্ষে সম্পদ হিসেবে কাজ করেছিল।

বলতে গেলে প্রথম থেকেই মুসলিম সমাজ পড়তে পারাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা

করা হয়। এ-সময়ে ইউরোপে ধর্মযাজকদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান ছিল একচেটিয়া বিষয়।[৫] এটি ছিল সাক্ষরতার ওপর ব্যাপক মনোযোগসহ একটি অনন্য সমাজ। ইসলামের প্রথম শতাব্দীর স্কলারদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে উন্নত করে পরিশ্রম, জ্ঞান এবং ধার্মিকতা। সেই সময়ে কুরআন শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। রাসূল সা.-এর শিক্ষা, তাঁর আমল ও তাঁর নিকটবর্তী উত্তরসূরিদের আমলের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। ■

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা

প্রথম মুসলিম সমাজ ছিল উন্নয়নকামী সমাজ। এ সমাজে মুসলিমগণ কুরআনের প্রত্যাদেশ, রাসূল সা.-এর আচার-আচরণ অনুসরণে মাধ্যমে তাঁদের জীবনপ্রণালী পরিবর্তন করে নিয়েছিল। জীবনের সব ব্যাপ্তিতেই এসব বিষয় বিদ্যমান ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলতে হয়, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন গঠন এবং আল্লাহর দুনিয়ার সৌন্দর্য উপভোগের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালনার কথা কুরআনে গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্মের সময়েও ইসলাম মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। কুরআনে মানবদেহকে একটি অলৌকিক ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুমে এ-দেহ আল্লাহর দেওয়া গুণাবলি অর্জন করতে পারে।[৬] সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহ মানুষকে মর্যাদার উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

> আমি আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি (কুরআন, ১৭:৭০)।

রাসূল সা. কুরআনের সৃজনশীলতা ও যুক্তির অনন্য শিক্ষা অনুসরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ সা. মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সা. তাঁর ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনে বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ওহি লাভ করেন। ওহি লাভের পর তিনি মক্কার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তা প্রচার করেন। ওহি প্রচারের কারণে মক্কাবাসী তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। ভবিষ্যৎ নগরী মদিনায় চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর ওপর মক্কাবাসীর নির্যাতন চলতে থাকে।

রাসূল সা.-এর হিজরতের পর থেকে ইসলামী পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রথম মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর রাসূল সা. ও তাঁর সাথীগণ মক্কা জয় করেন এবং মক্কাকে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূল সা.-এর এ লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতার অংশ হিসেবে জিহাদের সূত্রপাত হয় বা মূল্যবান কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার যাত্রা শুরু

হয়। এরূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছার কার্যক্রম শুরু হয়। মসজিদ হয়ে ওঠে সমাজের জন্য শিক্ষা, সরকার পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। গরিবদের সাহায্যের জন্য কর ব্যবস্থা ও মুসলিম দানশীলতা এ-সময়ে প্রবর্তিত হয়।

নেতা হিসেবে রাসূল সা. ছিলেন বিনয়ী ও ভদ্র। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি চাইতেন নারী-পুরুষ সবার প্রতি সমান আচরণ করা হোক। এ সময়ের উন্নয়ন ছিল লক্ষণীয়, যখন কন্যাসন্তান প্রসবকে পিতারা অমঙ্গল হিসেবে মনে করত এবং অভ্যাসমতো কন্যাশিশুকে হত্যা করা হতো। রাসূল সা. বলেন, নারীগণ বিবাহের পর তাদের পিতৃপ্রদত্ত নাম রেখে দিতে পারে এবং সেটি স্বামীর অভিভাবকত্বের অধীনে হবে না। পুরুষদেরকে অসংখ্য স্ত্রী রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীদের দেওয়া হয়েছে তালাক, খোরপোশ ভাতা[৭] ও শিশু সহায়তা[৮] (Child Support) ভাতা, সম্পত্তির অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের[৯] অধিকার। নবী সা.-এর সময়ে এগুলো ছিল অন্য সময় থেকে অনেক অগ্রসরমান।

যতই ইসলামের ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ততই সবার স্বার্থে একটি সাধারণ আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। এসব আইন প্রতিষ্ঠার পেছনে চারজন স্কলার ছিলেন: আবু হানিফা, মালিক ইবনে আনাস, মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আল শাফি এবং আহমদ ইবনে হাম্বল। এর মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন আবু হানিফা; যিনি কুরআনকে আইনের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং রাসূল সা.-এর হাদিসগুলোর সত্যতা নিরূপণে কঠোর সাধনা করেন। ইসলামী আইনের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবতাবাদী। তাঁর ছাত্ররা একেকজন ইসলামী আইনের ওপর বিশেষজ্ঞ। তাদের সাধনার ফলে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ■

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলিমগণ একদিকে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে, অন্যদিকে চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেন। আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। প্রথমত, মুসলিমগণ আশ্চর্যজনক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেন। শত্রুর মোকাবেলায় উপস্থিত মুসলিম সংখ্যাকে অনেক প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা আজ অন্যভাবে বর্ণনা করছেন। তাদের ধারণা শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের সংখ্যা দৃশ্যমানের চেয়ে বেশি ছিল। শান্তিকামী বিশ্বসমাজ মুসলিমদের প্রতি কেমন আচরণ করেছিল তা দেখা ছিল মুসলিমদের ভবিষ্যতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহু ইহুদি ও খ্রিষ্টান বাইজাইন্টাইনিদের[১০] হাতে নির্যাতিত হওয়ায় মুসলিম আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাদের ভাষায় মুসলিম শাসকগণ সৎ ছিলেন। রাসূল সা. মুসলিমদের অন্য দেশের 'মানুষদের সাথে ভদ্রভাবে আচরণের' নির্দেশনা দিয়েছিলেন।[১১]

মুসলিমগণ যেসব জায়গা দখল করেছিলেন সেগুলো ধ্বংস করা হয়নি। বিজিত নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করা হয়নি। মুসলিম সেনাবাহিনী কোনো নগর দখল করেনি, তারা শুধু তাদের নগরের সন্নিকটে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। কায়রো[১২] নগরীর ন্যায় তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো কোনো ঘাঁটি নগর হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বাগদাদ[১৩] নগরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য খ্যাতি লাভ করে এবং ইতিহাসে প্রথম মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক নগরীর মর্যাদা লাভ করে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা চার ইমামের তিনজনই এখানে বসবাস করেন এবং তাদের কর্মজীবন এখানেই অতিবাহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আব্বাসি বংশের রাজধানী ছিল এই বাগদাদ নগরী। মোঙ্গলরা ১২৫৮ সালে বাগদাদ নগরী ও এর গ্রন্থাগারগুলোর ধ্বংস সাধন করে।

ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল তলোয়ারের জোরে, এ-ধারণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম শাসনে থাকা দেশ ইরান, ইরাক, মিশর, তিউনিশিয়া ও স্পেনে তারা ছিল সংখ্যালঘু।[১৪] ভারত ও সিসিলিতে মুসলিম শাসনের অধীনেও মুসলিমরা সংখ্যালঘুই ছিলেন।[১৫] সার্বিকভাবে মুসলিম শাসকরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের এলাকাগুলোয় তাদের কোনোরূপ ক্ষতি করেননি। মুসলিম বিজয়ের পর অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।[১৬] কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই শুধু বণিক ও সুফিদের দ্বারাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রসার লাভ করে।[১৭]

মোঙ্গলরা যখন তাদের অগ্রাভিযান পরিচালনা করে, তখন তারা মুসলিম বিশ্বেও উল্লেখযোগ্য একটি অংশের ধ্বংস সাধন করেন। আবার এ মোঙ্গলরাই নিজে নিজে ইসলামে দীক্ষিত হন। মুঘলদের ন্যায় মোঙ্গলরা তাদের নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। মুসলিম সম্প্রসারণের গোড়ারদিকের দশকগুলোতে খ্রিষ্টানদের দ্বারা ইহুদিরা নির্যাতিত হচ্ছিল, তখন ইহুদিদের প্রতি মুসলিমগণ সুশীল আচরণ করেছিলেন। ইহুদিরা যারা খ্রিষ্টান নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তারা মুসলিমদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। স্পেনে মুসলিমরা দেশের বিভিন্ন এলাকার শাসনভার ইহুদিদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। অন্যান্য মুসলিম দেশে ইহুদিগণ তাদের সমাজে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল এবং তারা তাদের বিধিবিধানের অধীনেই পরিচালিত হচ্ছিল। তারা মুসলিম জীবনযাপন এবং সরকার পরিচালনা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল। বেশিরভাগ ইহুদি স্কলার রাজধানীর আশেপাশে থাকায় মুসলিম শাসনের অধীনে ধর্ম ও দর্শনে ইহুদি পাণ্ডিত্যবৃত্তি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল। মুসলিম স্পেন ছিল ইহুদিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র। ■

পঞ্চম অধ্যায়

ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতা

মহাসাগরসমূহের ওপর ইসলামের আধিপত্য লাভের সাথে সাথে মুসলিম সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃতি লাভ করে। শত শত বছর ধরে আরবরা নৌকা ও জাহাজে ভ্রমণ করে, আর বাণিজ্যসামগ্রী বন্দর থেকে বন্দরে পরিবহন করে নিয়ে যায়। মুসলিমরা তাদের নৌশক্তির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন; এর সাথে রাডার সংযুক্ত করেছিলেন এবং পশ্চিমারা ক্রুসেডের সময় এর সম্মুখীন হয়েছিল। এরপর তারা জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করে যা তারা গ্রিকদের কাছ থেকে অধিগত করেছিল। মুসলিমরা চীনাদের কাছ থেকে চৌম্বক সুচের (Magnetic Needles) কারিগরি জ্ঞান অর্জন করেন।[১৮] এ-সময়ে কম্পাসও আবিষ্কার করেন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান রা.-এর সময়ে নৌশক্তি দ্রুত উৎকর্ষ সাধন করে আর ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এরপর মুসলিম জাহাজ ভারত, চীন ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দিকে বাণিজ্যের উপলক্ষ্যে যাতায়াত করে। ইংরেজি অ্যাডমিরাল (Admiral) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবি আমির থেকে।

স্পেন ও সিসিলি বিজয়ের পর মুসলিমরা আর কোনো অতিরিক্ত বিজয় অভিযান ও রাজ্য বিস্তারের দিকে অগ্রসর হননি। সিসিলির কলা সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষিতে ইসলামী সভ্যতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। দুশত বছর ধরে মুসলিমরা সিসিলি শাসন করেন। এ-সময়ে রাজা রজার-১ এর অধীনে দ্বীপের শাসন ক্ষমতা থাকে মুসলিমদের হাতে। দ্বীপের ব্যাবসাবাণিজ্য ও কৃষিব্যবস্থা মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ-অবস্থার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট-ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্র যৌগের সৃষ্টি হয়। রজার-২ ও ফ্রেডরিক-২-এর আমলে সিসিলিতে মুসলিম সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে। মুসলিমদের নৌযান নির্মাণ ও নৌপরিবহন দক্ষতা সিসিলিকে বিশ্বে একটি নেতৃস্থানীয় মেরিটাইম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। রাজা রজার-২-এর সময়ে সিসিলির এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।[১৯] পূর্বেও মুসলিম বিশ্বের সাথে

রাজা ফ্রেডরিক-২-এর এক অসাধারণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলিম শাসকরা ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুসলিমদের সাথে এরূপ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য তাকে ইউরোপের শত্রুতে পরিণত করে।[২০]

মুসলিম ব্যবসায়ী ও নাবিকদের বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ভূগোলের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আরেকটি বড় অবদান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ভ্রমণকাহিনি লিখন ও এগুলোর রেকর্ডপত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও বিশ্বসভ্যতা বিকাশে অবদান রাখে। ইতোমধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেমন ভারত, দক্ষিণ রাশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে মুসলিম বিজয় অভিযান চলতে থাকে। এসব দূরবর্তী দেশে যোগাযোগের জন্য মুসলিমরা ডাক প্রথার প্রবর্তন করেন। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদকে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মুসলিমদের এসব উন্নতি ও আবিষ্কার কুরআনের এবং রাসূল সা.-এর হাদিসের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুসলিমরা অন্য সংস্কৃতির প্রতি ছিল উন্মুক্ত ও উদার। তারা অন্য সংস্কৃতি থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। যেখানেই ইসলাম পৌঁছেছে, সেখানেই ইসলাম সুশীল সমাজের প্রবর্তন করে। অনেক শহর ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এশিয়ার বহু স্থান বাণিজ্যপথের কাছাকাছি হওয়ায় মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ও সুফিগণ এসব স্থান থেকে দূরের এলাকাগুলোতে ইসলামের প্রসার ঘটান। উত্তর ও দক্ষিণে ধর্ম ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের ধারা অব্যাহত থাকে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মুসলিম বিশ্বের গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল না। ধর্মীয় নেতাদের সাথে শহরগুলোর ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। অন্যান্য সাম্রাজ্যের বিজয় কাহিনির সাথে ইসলামের বিজয়ের কাহিনি এক ছিল না। এর কারণ– মুসলিম শাসন ছিল ব্যাপক অর্থে জনকল্যাণমুখী। মুসলিমরা যেসব দেশে বসতি স্থাপন করেছেন সেখানেই তারা জীবনকে গতিশীল করেছেন, ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি করেছেন ও শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ■

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাবসাবাণিজ্য

আরবরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার শত শত বছর পূর্বেই ব্যাবসায়িক কাজে নিয়োজিত ছিল। বিশেষ করে তারা ফসলাদি ও সুগন্ধি দ্রব্যের চাষাবাদ ও বিক্রয় করত। সুগন্ধি সড়ক (Incense Road) নামের পথ ধরে এ ব্যাবসাবাণিজ্য পরিচালিত হতো। মক্কার মধ্য দিয়েই বাণিজ্য কাফেলা চলত। মুসলিমরা উৎসাহী ব্যাবসায়ী হয়ে উঠছিলেন। মিশর ও উত্তর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের প্রথম দিককার যুদ্ধবিগ্রহগুলো ছাড়া এ অঞ্চলে ব্যাবসাবাণিজ্যে ও ধর্ম-কর্মে মানুষ নিয়োজিত ছিল। আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলেও ইসলামের অনুসারীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখানেও মুসলিমরা ব্যাবসায়বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং বাণিজ্য কাফেলার পথ সম্প্রসারিত করেন। মুসলিমদের এ অবস্থা বিশ্বব্যাপী ইসলামী সভ্যতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। ব্যাবসায়বাণিজ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক উদারতার সমন্বিত পরিস্থিতি মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধির পথে অবদান রাখে। মুসলিম বণিকরা পারস্য ও বাইজান্টাইনের ন্যায় দুই শক্তির মধ্যে কার্যকরভাবে যোগসূত্র স্থাপনে সফল হন। এর ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যমান বাণিজ্যপথগুলোতে ও বিজিত এলাকাগুলোতে বাণিজ্যসামগ্রীর পরিমাণ বেড়ে যায়।

মুসলিমরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে থাকেন। আর এভাবে তারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থ উপার্জন করেন। বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোক্তার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অমুসলিমদের মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে এ সময়ে মুসলিমদের ব্যাপক ব্যাবসাবাণিজ্যের কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গ্রামাঞ্চলেও মুসলিমরা বাইজান্টাইনি ও পারস্যদের সময়ের চেয়েও উচ্চমানের জীবনযাত্রা উপভোগ করেন। মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাবসায়ীদের বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বণিকরা এ-সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন এবং কারিগররা এ সময়ে উচ্চ মর্যাদা উপভোগ করছিলেন।

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে সুগন্ধি সড়কের ব্যাপারে কুরআনে সুরক্ষামূলক আদেশ জারি রাখা হয়।[২১] এ সুগন্ধি সড়ক পরবর্তীতে হজ সড়ক (Pilgrimage Road) নামে অভিহিত হয়। মুসলিমদের নিকট ব্যাবসাবাণিজ্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মক্কায় হজের সময়েও মুসলিমরা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতেন। এভাবে মক্কা নগরী ধর্মের শান্তিপূর্ণ জায়গা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে আফ্রিকায় যে পরিমাণ বাণিজ্যের কথা জানা যায়, তার চেয়ে বেশিমাত্রায় এখানে মুসলিমদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে ইসলামী সভ্যতা আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। উপ-সাহারা মরুভূমির কথা বাদ দিলে ব্যাপকভিত্তিক বাণিজ্যিক পথ পশ্চিম সাহারা হতে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আফ্রিকার অর্ধেক মানুষ মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্যের সাথে সাথে ইসলামও এখানে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। শুধু ভাষার মাধ্যমেই মহাদেশের অঞ্চলগুলো বিভক্ত হয়। আফ্রিকায় ইসলাম গ্রহণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধানের সৃষ্টি করে। আফ্রিকানরা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন এবং সক্রিয়ভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এ-সময় ইউরোপের সাথে বাণিজ্যের জন্য ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলোর উন্নয়ন এবং বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সাথে এগুলোর সংযোগ সাধন করা হয়।

আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে চীনের সাথেও দ্রুত মুসলিমদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময় অনেক ব্যবসায়ীই চীনে বসতি স্থাপন করেন। এভাবে সেখানে উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে। চীনের মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হয়। দেখতে দেখতে মুঘল শাসকগণও ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। সিল্ক রোড নামে মুসলিমরা এ-সময় আরেকটি বাণিজ্যপথ খুলে দেন। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রেশমি দ্রব্য আনা-নেওয়ার কাজে এ সড়কপথ ব্যবহৃত হতো। মুসলিম বণিকরা এ পথের উন্নয়ন সাধন করেন এবং একে নিরাপদ পথ হিসেবে গড়ে তোলেন। সমুদ্রপথে সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি পারস্য ও চীনের মধ্যে প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই চালু ছিল। সড়কপথে প্রথম দিকের মুসলিম ও চীনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম চীনের মধ্য দিয়ে। ক্যান্টন'র মুসলিম জনগণ এ-সময় সমৃদ্ধি লাভ করেন। ক্যান্টনে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এখানে ইসলামী বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

চীনা অধিবাসী ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং নৌপরিবহন ও নৌশক্তিতে মুসলিমদের অগ্রগতির ফলে চীনারা উপকৃত হয়। ভারত ও চীনের মধ্যে 'Monsoon Routes' দিয়ে বাণিজ্য চালানোর সময় স্থানীয় জনগণ ও বণিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এছাড়া মুসলিমরা চীন ও পশ্চিমের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এর ফলে বণিক সম্প্রদায় দূরপ্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে মুসলিম স্পেনে[২২] সহজে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারতেন। এরূপ বাণিজ্যিক ঐক্য শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয়দের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। মুসলিমদের ব্যাবসাবাণিজ্য ইউরোপ মহাদেশকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। ছোট ছোট সামন্তীয় পকেট (Feudal Pocket) ইউরোপকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশাল এলাকায় পরিণত করে। এটি ইসলামের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সাথে সাথে রেনেসাঁ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। ■

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি ও প্রযুক্তি

কৃষি ছিল মুসলিম বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান এবং মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের আরেকটি নির্ধারক উপাদান। ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে বিকৃত ও গৎবাঁধা ধারণার কারণে পাশ্চাত্যে এই ইতিহাসের খুব কমই জানা যায়। বস্তুতপক্ষে মুসলিমরা ছিলেন অভিজ্ঞ। ফলে তাদের মাধ্যমে কৃষিসামগ্রী সহজলভ্য হয় এবং এ সময়ে আলফালফা (Alfalfa) জাতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হয়। মুসলিমরা এমন কিছু পরিবর্তন সাধন করেন যাতে উৎপাদন বেড়ে যায় ও অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। এসব উদ্ভাবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উচ্চ ফলনশীল ফসলের উদ্ভাবন, ভূমির বিশেষায়িত ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন। এসব উন্নতির ফলে ফল-ফলাদি, সবজি, চাল, শস্যদানা, ইক্ষু, পামতেল ও তুলার উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[২৩]

মুসলিমরা তাদের কৃষিসামগ্রী ও চাষের পদ্ধতি মুসলিম স্পেনে নিয়ে যান। এর ফলে এখানে বড় ধরনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং এগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ায় রপ্তানি হয়। মুসলিমরা এশিয়ায় উৎপাদিত লেবু, কলা ও আম জাতীয় ফল-ফলাদি বিভিন্ন দেশ ও সুদূর স্পেনে আনয়ন করেছিলেন। তারা তরমুজের আবাদ করেও এর বিস্তার ঘটান। উৎপত্তির বাইরের স্থানে পালংশাক, বেগুন ও ডাটা জাতীয় তিন ধরনের সবজি চাষ করেন। মুসলিমরা গম, জোয়ার ও ধানের ন্যায় ফসলাদির চাষে ব্যাপক অবদান রাখেন। অনেক সময় তারা নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন ও এগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। ভাষা বিদ্যার গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় সম্ভবত মুসলিমরাই সুদূর ইতালিতে পাস্তা (Pasta) আনয়ন করেছিলেন।[২৪]

মুসলিমদের মধ্যে ভাতের খাদ্যাভ্যাস ছিল। এটি ছিল তাদের মূল খাদ্য। তারা নারিকেল ও খেজুর পশ্চিমের দেশগুলোতে নিয়ে যান। ভাষা গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, মুসলিমরা পশ্চিমের দেশগুলোতে কৃষিজাত পণ্য নিয়ে যান। ইংরেজি ’Sugar’ শব্দটি আরবি ’Sukkar’ থেকে নেয়া হয়েছে।

মুসলিমগণ বিশ্বে তুলা শিল্পেও উন্নতি করেছিলেন। কটন শব্দটি আরবি থেকে উদ্ভূত এবং তুলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মুসলিমদের শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। অনেক মুসলিম দেশে ও ইউরোপে তুলার ব্যাপক চাষাবাদ করা হয়েছিল। তুলার বিতরণ ব্যবস্থা একটি বড় ব্যবসায় পরিণত হয়। এ-সময় বাগদাদে তুলার জন্য একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামের পূর্বেও কৃষিজাত পণ্য ছিল, তবে বিতরণ ব্যবস্থা ও বৈচিত্র্যে এ সভ্যতা ভিন্নতার সৃষ্টি করে। ইসলামী সভ্যতা এগুলোকে বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারিত করে। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও চীনের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ইসলাম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ-সময়ে চীনে সীমান্ত সম্প্রসারণের চেয়ে প্রবৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম সরকার জিনিসপত্র ও জনসাধারণের চলাচলের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দেশের আইন ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, ওজন ও পরিমাপ, সড়ক ও মরুপথের যাত্রীদের জন্য রাস্তার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছিলেন। মুসলিম প্রকৌশলীগণ সেচ ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যেমন– ঘড়ি ও বায়ুকলের উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশন, কাচ শিল্প, সুগন্ধি তৈরি, কার্পেট ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বিকাশে উন্নতি সাধন করেন। সর্বোপরি মুসলিম সাম্রাজ্য ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব ও এশীয়দের ওপর বহু শতাব্দী ধরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ-সময় ধর্ম ও সংস্কৃতির সফল সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বন্ধুসুলভ ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম কৌশল, উৎপাদিত দ্রব্য ও ভাষার অনুপ্রবেশে সাহায্য করে থাকে। ■

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষার ফুল ফুটানো

মুসলিম সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মুসলিমদের জ্ঞান আহরণের বিস্তার ঘটতে থাকে। জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা আব্বাসীয় খলিফার আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে মুসলিমগণ লেখালেখি শুরু করেন। তারা প্রাথমিকভাবে কুরআনের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে রাসূল সা.-এর জীবনীর ন্যায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা যেমন– গ্রিক, ফার্সি থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলতে থাকে। পরবর্তীতে আরবি ভাষা পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ-সময় ফারসি ভাষায় অনেক আরবি শব্দের ব্যবহার হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইরানের জুনদিশাপুরের লাইব্রেরিগুলো মুসলিম যুগে জ্ঞান প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরিগুলো বাড়িতে নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার ন্যায় জ্ঞান বিস্তারে অবদান রাখে। এ-সময় স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় আল হাকামের ব্যক্তিগত সংগ্রহেই ছিল ৪ লাখ গ্রন্থ। কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা বিশ্বেও এখনো জ্ঞান বিস্তারে অ্যাকাডেমিক ঐতিহ্য পালন করে আসছে।

খলিফা হারুন আল-রশিদই ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি বিশ্ব রাষ্ট্রনায়কে (World Statesman) পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে বাগদাদ ইসলামের সোনালি যুগের হৃদয় হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। আরব্য উপন্যাসের মাধ্যমে খলিফা হারুন আল-রশিদের খ্যাতির ইতিকথা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। যোগ্য শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে হারুন আল-রশিদের উত্তরাধিকারী পুত্র আল-মামুন আইনশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, রূপক শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। আল-মামুন খলিফা হওয়ার পর বাগদাদকে জ্ঞানের আবাস (House of Wisdom) হিসেবে গড়ে

তুলেছিলেন। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে স্কলারগণ গবেষণা করতে আসতেন। বাগদাদ জ্যোতির্বিদ্যা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ-সময় গ্রিক, সিরিয়ান, পারসিয়ান ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করা হয়। আরবি ভাষায় গ্রিক গ্রন্থরাজি ভাষান্তর হয়ে ল্যাটিন ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছিল। এসব অনুবাদকর্ম ও গবেষণার মাধ্যমে অ্যারিস্টটল ও গ্রিক সাহিত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ পুনর্জীবন লাভ করে। অনুবাদের সময় পশ্চিমা কথা বা 'সনাতনী গ্রিস' (Classical Greece) বলতে কিছুই ছিল না।

নারীসমাজ কুরআন, আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, কলা শাস্ত্র, ওষুধ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। নারীরা ওষুধ বিজ্ঞানের ওপর অধ্যয়ন করলেও তখন ধাত্রীবিদ্যার ব্যাপক চাহিদা ছিল। নারীরা শল্যচিকিৎসক হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। এসময় অনেক নারীই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছিলেন। নারীদের মধ্যে এ সময় ১৭ জন শাসক ও প্রশাসক, ৯ জন বাগ্মী, ৪ জন মসজিদ ও অন্যান্য জনহিতকর সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, ৪২ জন ধর্মতত্ত্ববিদ, ২৩ জন গীতবাদ্যকার ও ৭৬ জন কবি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খলিফার স্ত্রীগণ এ-সময়ে একে অপরের সাথে কাব্য রচনায় প্রতিযোগিতা করতেন।[২৫]

এ সময়ে ইমাম আল গাজ্জালি ছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতার এক বিরাট উদাহরণ। তিনি ছিলেন ইসলামী ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। ইবনে খালদুন ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের স্থপতি, তিনি ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের অগ্রদূত। ইতিহাসে বড় বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আরনল্ড টয়েনবি তাঁর *মুকাদ্দিমাকে* (মুখবন্ধ, বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর কর্ম)-ওই সময়ের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক কর্ম হিসেবে অভিহিত করেন।[২৬] ইবনে খালদুনের প্রেক্ষিতটি ছিল একটি বিশাল ব্যাপার। সৃষ্টির সময় হতে ঘটনার পূর্ববর্তী বছরগুলোর বিষয় বিশেষ করে বাইবেল, পারস্য, গ্রিক ও রোমীয় যুগ এবং আরব ইতিহাসের বিষয়ও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদীক্ষায় আরবি ভাষা ব্যবহৃত হতো। পশ্চিমাদের মধ্যে আরবি ভাষার স্কলারের অভাব ছিল না। বিশেষ করে কর্ডোভার মুসলিম শিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে এর কোনো অভাব ছিল না। পশ্চিমা স্কলারদের এভাবেই আবির্ভাব ঘটেছিল। এ-সময় গির্জা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো মুক্ত পরিবেশে বেরিয়ে আসছিল। অন্য সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত

শিক্ষাকে প্রতিভাদীপ্ত ইসলামী সভ্যতার মধ্যে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা এ-সময়ে দেখানো হয়েছিল। এভাবে ইসলামী সভ্যতা নিজেদের একটি সামাজিক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল এবং বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি অবদান তৈরি করেছিল। পুরো ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এভাবে সার্বক্ষণিক একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতা চলমান ছিল। ■

নবম অধ্যায়

বিজ্ঞান

কুরআনে জোরালোভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বস্তুগত বিশ্বে আল্লাহর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। কুরআনের বহু স্থানে প্রকৃতি আর বিজ্ঞানের উপাদানসমূহ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে যুক্ত করা হয়েছে, আর এর মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহ দান করা হয়েছে।[২৭] প্রাকৃতিক বিশ্বের নিদর্শন থেকে কুরআনে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে আর *তকদির* বা 'পরিমাপের' বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব বিষয় হলো পরিমাণ ও গুণগত মানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং এর কোনো কিছুকেই অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখা।[২৮]

প্রথম দিকের মুসলিম স্কলারগণের মতে পৃথিবী ছিল গোলাকার। কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তারা এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। রেনেসাঁর যুগে ইউরোপীয়রা মুসলিম বিজ্ঞানের এ ধারণাকে মানতে পারেনি। তাদের ধারণা পৃথিবী গোলাকার নয়, চ্যাপ্টা।[২৯] মুসলিম স্পেনে এরিস্টটলের মতবাদের সমর্থনে সরাসরি টলেমির তত্ত্বকে মুসলিম ও ইহুদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ-সময় টলেমির গ্রহসম্পর্কীয় মডেলের সংশোধন এনে মুসলিম বর্ষপঞ্জি তৈরি করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তারা অন্য গ্রহপুঞ্জে অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[৩০] মুসলিমরাও গ্রিক জ্যামিতি জানার পূর্বে একটি পাই (pi) ব্যবহার করে পরিধি গণনা করেছিলেন।

মুসলিম বিজয়ের সময় বাইজান্টাইন ও পারস্যের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করা হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বে এ-সময় জুনদিশাপুর বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ-কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ উমাইয়া শাসনামলে রাজধানী দামেস্কে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য এসেছিলেন। ইসলামী বিজ্ঞান বিশ্বে শত শত বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আব্বাসীয় শাসনামলে

বিজ্ঞানচর্চা ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। এ-সময় মুসলিম স্কলারগণের কাছ থেকে শিক্ষার জন্য ভারত, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও পারস্য হতে বাগদাদে স্কলারগণ জড়ো হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণার বিষয়গুলো এ-সময় লেখা হয়েছিল। সব গবেষণার বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্বে আরবিতে ভাষান্তর করা হতো। এর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন পরিভাষা ও বিভিন্ন মহান সৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নয়ন পর্যটকদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। পর্যটকদের কাছে গ্রহপুঞ্জের অবস্থান, নক্ষত্রের পথপরিক্রমা ও সময়ের হিসাবের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরবদের জীবনে চাঁদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'চাঁদের বিভিন্ন ধাপ' নামে নক্ষত্রপুঞ্জকে তারা ধারাবাহিক ২৮ ভাগে ভাগ করেছিলেন। বিভিন্ন ধাপে চাঁদের অবস্থানকে বছরের ঋতু হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[৩১] মুসলিম স্পেনই পশ্চিমাদের শিখিয়েছিল যে, পৃথিবী একটি গোলাকার বস্তু বা গ্রহ। এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ণিত অন্যান্য গ্রহের মতো পথ প্রদক্ষিণ করে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম বিজ্ঞানের রসায়নশাস্ত্র প্রায় দেড়শত বছর ধরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিমরা গণিতশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করে। এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে মুসার আলগরিদম, অ্যালজাবরার উন্নয়ন, জ্যামিতিক সমাধান, ডিগ্রির পরিমাপ, ত্রিকোণমিতি ও সারণি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২] পারস্য, ভারত ও প্রাচীন গ্রিসের ন্যায় সভ্যতার প্রতি খোলামেলা মনোভাবের জন্য ইসলামী বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করে। মুসলিম শাসকদের অনুবাদ কার্যক্রমের প্রতি তীব্র আগ্রহ এ-সময়ে সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইসলামের বিজ্ঞানশাস্ত্র ইসলামী রেনেসাঁয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ■

দশম অধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্র

ইসলামের প্রথম দিকের বছরগুলোতে চীন, ভারত, গ্রিস ও পারস্য চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। গ্রিক স্কলারগণ পারস্যের জুনদিশাপুরের মতো প্রাগ্রসর শিক্ষা কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ফলে আরব ও পারস্য দুনিয়ায় এসব দেশের চিকিৎসকগণ অবদান রেখেছিলেন। এ-সময়ে কোনো কোনো চিকিৎসক ছিলেন নবী মুহাম্মদ সা.-এর সমসাময়িক। এ-চিকিৎসকগণ অসুস্থতায় সুষম খাবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে ডাক্তারি পরামর্শ দিতেন। মুসলিম বিশ্বে ওষুধশাস্ত্রের উন্নতির সাথে সাথে পরবর্তী খলিফাগণ চিকিৎসা পরামর্শের জন্য পারস্যের জুনদিশাপুরের চিকিৎসকদের ওপর বিশেষ করে নবম খ্রিষ্টাব্দ হতে হুনাইন ইবনে ইসহাকের ন্যায় রাজকীয় ডাক্তারদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। ডা. হুনাইন ইবনে ইসহাক গ্রিক গ্রন্থরাজি আরবিতে অনুবাদ করেন। এছাড়া শখানেকের মতো চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। মুসলিম বিশ্বে এগুলো খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এগুলো থেকে ভবিষ্যত চিকিৎসকগণকে উন্নতির শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল।

আব্বাসীয় আমলের সকল স্কলারগণ চিকিৎসার বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং অনেকেই চিকিৎসার বহুবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এ-সময়টা ছিল জ্ঞান আহরণের অনুকূল এবং জ্ঞানীগুণীদের তখন ভীষণ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে ৮৬০ জনের মতো লাইসেন্সধারী চিকিৎসক, বহু হাসপাতাল ও স্কুল ছিল।[৩৩] ইসলামী চিকিৎসার ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বহু গ্রন্থের লেখক, দার্শনিক ও বিখ্যাত চিকিৎসক আল-রাজি, আল-মাজুসি ও ইবন সিনার ন্যায় তিন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। আল-রাজির কাজ আরবি চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিপক্বতার নিদর্শন স্থাপন করেছিল। তার বিখ্যাত আবিষ্কার ছিল গুটিবসন্ত ও হামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়। তিনি দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন– এর অর্ধেক ছিল ওষুধশাস্ত্রের ওপর। এর মধ্যে তাঁর প্রণীত দশ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রিক ওষুধশাস্ত্রের গবেষণাগ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য।

আবু আলি আল-হুসায়েন ইবন সিনা (আবিসিনা) ছিলেন মুসলিম পণ্ডিত ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাশাস্ত্রে তার প্রতিভাময় কাজের মধ্য দিয়ে মুসলিম ওষুধশাস্ত্র খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইবনে সিনার *আল কানুন ফি আল তিব্ব* (*The Canon of Medicine*) পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থটি *The Canon* শিরোনামে মাস্টারপিস হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।[৩৪]

মুসলিম স্পেনের প্রথম শতাব্দীগুলোতে ভালো চিকিৎসক হওয়ার আশায় শিক্ষার্থীরা বাগদাদ, কায়রো, দামেস্ক ও ইরান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তারা এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলো থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এর পরের দিকে মুসলিম স্পেন নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের ওপর বিভিন্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এ-সময় সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ছিলেন আন্দালুসিয়ার ইবন রুশদ বা এ্যাভেরোর ন্যায় ব্যক্তিত্ব। তিনি পশ্চিমা বিশ্বের দর্শনকে প্রভাবিত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিচারক, চিকিৎসক ও ব্যাপকভিত্তিক মেডিকেল বিশ্বকোষের প্রণেতা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এডওয়ার্ড ব্রাইনির মতে, আরব ও অনারব মুসলিমগণ বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব আবিষ্কারে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন। তারা গ্রিকদের কাছ থেকে রসায়ন ও মেডিসিন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। এর ফলে মুসলিমরা ওষুধ প্রস্তুতে রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যাকে আলাদা বিষয় না ভেবে একই বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের মেডিকেল ও ওষুধ প্রস্তুত শাস্ত্রের জ্ঞান মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যতিক্রমধর্মী মেডিকেল স্কুলসমূহের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফরের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল।

মুসলিমরা তাদের হাসপাতালের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিমরাই বিশ্বে প্রথমবারের মতো দক্ষতাসম্পন্নদের মাধ্যমে কার্যকর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও মুসলিমরাই ফার্মেসিশাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ইসলামী সভ্যতা ওষুধ প্রস্তুত শিল্পের জন্য পরিভাষা আবিষ্কার করে এগুলোকে ইউরোপীয় ওষুধ শিল্পে হস্তান্তর করে। এর মধ্যে ওষুধ প্রস্তুতের প্রণালী উল্লেখযোগ্য। মুসলিম মেডিসিন ছিল প্রভাব বিস্তারকারী ও সুদূরপ্রসারী; মধ্যযুগের ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্র ছিল তার কেন্দ্রবিন্দুতে (focus) পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং ব্যাপকভিত্তিক। ■

একাদশ অধ্যায়

আরবি সাহিত্য

পুরো ইসলামী সভ্যতায় সাহিত্য ও শিল্পকলা (Art) ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক। এগুলো মুসলিম সৃজনশীলতাকে মানুষের অবদান হিসেবে উন্নীত করেছিল এবং অমুসলিম দেশসমূহে মুসলিম সৃষ্টিগুলোকে একীভূত করেছিল। মুসলিম সাহিত্যের ভিত্তি ছিল এর ভাষা ও এর ব্যবহারবিধি। প্রতিটি সংস্কৃতিরই তার নিজস্ব ব্যতিক্রমী গঠনবিধি, রূপকতা, প্রতীকীভাব, সাহিত্য উপাদান রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে এটি বিশেষভাবে সত্য একটি বিষয়। মুসলিমের নীতি ও স্বতন্ত্রতা সাহিত্যরসে থাকা মুসলিম সাহিত্যের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। কুরআন এবং ইসলামের জ্ঞান, প্রাক-ইসলামিক সাহিত্যিক ঐতিহ্য যেমন– পদ্য, বাগ্মিতা, কল্পকাহিনি, ঐতিহাসিক সত্যনির্ভর উপজাতীয় উপাখ্যান এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র এর অন্তর্ভুক্ত। মহান ইতিহাসবিদ ইবন খালদুন উল্লেখ করেছেন যে, আবু আল-ফারাজের *গানের বই*-এ (*Book of Songs*) '[আরবরা] অতীতে সব ধরনের কবিতা, ইতিহাস, সঙ্গীত, ইত্যাদিতে যা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল তার সবই রয়েছে'।[৩৫]

প্রাক-ইসলামী গল্পগাঁথা ও উপাখ্যানগুলোর প্রধান নায়করা ছিলেন রাজা-বাদশাহ ও উপজাতীয় বীর। পদ্যের কাহিনিগুলো ছিল আরব বেদুইনদের। সুতরাং সঙ্গীতে মরু বীরদের বিজয়গাঁথাই ছিল তাদের গানের বিষয়। আরবরা কাব্যের উঁচু স্তরের সমঝদার ছিল। এ-সময় সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল *মুয়াল্লাকাত* (The Seven Odes– সপ্ত ঝুলন্ত কাব্য)।[৩৬] বহু আরববাসী আজও এগুলো মুখস্থ করেন এবং পুরো খণ্ডই তারা মুখস্থ আবৃত্তি করে থাকেন। এরপর যখন দেখা গেল সাহিত্য দ্বারা ইসলাম প্রভাবিত হয়েছে, তখন কুরআন কবিদেরকে তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রে বিরত করেনি, এমনকি নবী সা.-এর জীবদ্দশায়ও। রাসূল সা.-এর চেয়ে চার খলিফাই কাব্যের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। 'মহান মূল্যবোধে সঞ্জীবিত' এবং ইসলামী নৈতিক আদর্শে প্রণীত কাব্যগুলোকে তারা সম্মান দেখাতেন।[৩৭] উমাইয়া

শাসকদের সময় কবিদের কাব্য রচনা ও প্রাঞ্জল ভাষাশৈলীতে বেশি বেশি সৃজনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এ-সময় এক ধরনের প্রেমকবিতার গজলের আবির্ভাবও দেখা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলামপূর্ব যুগের প্রেমের কাব্য আবার লেখা শুরু হয় এবং এগুলো সঙ্গীতের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো মক্কা-মদিনার উমাইয়া শাসকদের অধীনে গানের অংশে পরিণত হয়। প্রেমকাব্য সরাসরি কোনো বিষয়ের ওপর প্রণীত না হয়ে এগুলো রহস্যময় কাব্যে পরিণত হয়।

যেখানে সবেমাত্র শিক্ষা বিস্তার ঘটেছিল সেখানে বক্তৃতার ভাষা ভাব প্রকাশের প্রাথমিক উপায় হলেও গদ্য রচনারও বিকাশ ঘটেছিল। সবচেয়ে পুরনো কাজগুলো ঐতিহাসিক ধরনের হলেও পুরনো কাহিনিগুলো লিখে রাখা হতো। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বিবরণগুলো ছিল ইসলামের প্রথম দিককার অলঙ্কৃত গল্পকাহিনি। ওই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পকাহিনি ছিল ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক রচিত রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের ইতিহাস। রাসূল সা.-এর আত্মীয়স্বজন ও সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎকারের কাব্যের ওপর ভিত্তি করে এই ইতিহাস প্রণীত হয়। ইবন ইসহাকের ইতিহাস ছিল রাসূল সা.-এর সময়ের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। সেগুলো পরে হাদিস আকারে সংরক্ষিত হয় এবং ‘রাসূল সা.-এর জীবনপ্রণালী’ হিসেবে সুন্নাহ নামে অভিহিত হয়। কুরআনের পর মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পথনির্দেশ হিসেবে বিদ্যমান আছে রাসূল সা.-এর হাদিস বা সুন্নাহ।

বেশিরভাগ গদ্য কাব্যই বীরদের নিয়ে রচিত মহাকাব্য। এগুলো ৫০০ বছর দীর্ঘ আব্বাসীয় যুগে রচিত হয় এবং খেলাফতের সময় আরো বেশি আকর্ষণীয় ও জনগণমুখী করে এগুলোকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করা হয়। গদ্য সাহিত্য এ সময়ে পদ্যের মহাকাব্যিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। উমাইয়া শতাব্দীর আরবি-ইসলামী সাহিত্য এবং আব্বাসীয় জমানার সাহিত্যের মধ্যে একটি পার্থক্য অবশ্যই টানা যেতে পারে। আব্বাসীয় শাসনকাল বিশেষ করে এর প্রথমার্ধের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মধ্যে বিশাল ব্যবধান দেখা যায়।

এ-সময়ে গদ্য সাহিত্য আধিপত্য বিস্তার করে। যদিও কাব্য সাহিত্য তখনও বেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। বেশি বেশি জ্ঞানার্জন ও অন্য সংস্কৃতির সাথে আরো বৃহত্তর পরিসরে যোগসাজশ এবং পারস্য সাহিত্যের যোগসূত্রের কারণে কাব্য সাহিত্য উৎকর্ষ সাধন করে।

প্রাথমিক সাহিত্যের সব গ্রন্থের মধ্যে *Thousand and One Nights* (*এক হাজার এবং এক রাত্রি*) ছিল সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। এই মহাকাব্যের বেশিরভাগ গল্পই ফারসি ভাষা থেকে সংগৃহীত। এগুলো আরব বেদুইনদের গল্পগাঁথা, আরবের লোককাহিনির সংকলন। মুসলিমদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসব গল্পকাহিনি সংগৃহীত হয়েছে। এ পদ্ধতি গল্প তৈরির পদ্ধতি ও এগুলোর গভীরতর অর্থকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।[৩৮]

গদ্যের স্টাইলে বর্ধিষ্ণু আগ্রহ *মাকামাতের* মতো নতুন পদ্ধতির অবতারণা করে। এগুলো ছিল নাটকীয় বক্রোক্তি ও দ্বিগুণ রসসাহিত্যে ভরপুর। আহমাদ আল-হামাদানির *মাকামাতকে* সূচনাকাল থেকেই কুরআনের আরবি সাহিত্যের আধার মনে করা হতো।[৩৯] আব্বাসীয় শাসনামলে কাব্য সাহিত্য ছিল প্রচুর। এগুলোর বিষয়বস্তু, কৌশল ও স্টাইল পূর্বের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধশালী ছিল। ■

দ্বাদশ অধ্যায়

পারস্য সাহিত্য

আরব বিশ্বের বাইরে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বড় অবদান ইরানের। আরবি ভাষায় লেখা হতো বলে আরব সভ্যতার ইতিহাসে ইরানি বংশোদ্ভূত বহু ইরানি স্কলারের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। ফারসি ভাষার উত্থানের পর ফারসি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। দ্রুতই ফারসি সাহিত্য তার মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে। ফারসি সাহিত্যের সোনালি যুগ হলো ইরানি ইতিহাস ও ইসলামী সংস্কৃতির সবচেয়ে লক্ষণীয় যুগ। রুমি, সাদি ও হাফিজের ন্যায় খ্যাতিমান কবিদের গ্রন্থরাজি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বিখ্যাত পশ্চিমা গ্রন্থকারদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

আরবি আর ফারসি উভয় ভাষা সমৃদ্ধশালী ভাষা হলেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবি ছিল ব্যাপক অর্থে জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। ফারসি ইতোমধ্যে সাহিত্যের লিপি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ফারসিতে ইসলামী সাহিত্যের অংশ হিসেবে মহাকাব্য প্রণীত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ফারসি ভাষাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ-সময় আরবি বর্ণমালা পাহলভি বর্ণমালার স্থান দখল করে। এর ফলে একটি আলাদা ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরও সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষা ও কুরআন এভাবে বিদ্যমান ফারসি ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে।[৪০] মুসলিমরা, বিশেষ করে আব্বাসীয়রা ইরানি ভাষা হতে যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি ইরানি সংস্কৃতিকে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি দানও করেছিলেন।

ইরানিরা যখন আরবি ভাষায় অন্য ভাষার গ্রন্থকে ভাষান্তর করতেন আরবরা তখন ইরানিদেরকে তাদের ভাষার শব্দশৈলী, ইসলাম ধর্ম ও কাব্যের অবয়ব দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আরবি *কাসিদা* (Qasida) প্রাথমিক যুগে ইরানিদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী সঙ্গীত হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইরানিরা তাদের মতো করে আলাদা ধরনের গজলের প্রবর্তন করেছিল। তৃতীয় ধরনের আরেকটি কাব্যিক রূপ রুবাইয়্যাহ কাব্য ইরানিরা সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে ওমর আল-খৈইয়ামের এ বিশাল গ্রন্থ

সুনাম অর্জন করে। চার লাইনের পঙ্ক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি ছিল ফারসি কাব্যের জন্য উপযোগী বাহন। ইরানি মসনভি দু-লাইনের ছন্দে প্রণীত এক কাব্য। এভাবে প্রণীত কিছু কিছু কর্ম হাজার হাজার লাইনে রুমির মসনভির ন্যায় পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রথম দিকে আরবি হতে অনুবাদের সময়ে ফারসি সাহিত্যের গদ্য রূপের সমৃদ্ধি ঘটে। কাব্যিক ভাষার অংশ হিসেবে ফারসি ভাষা মূল্যবান ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। ফারসি ভাষার সোনালি যুগ চলতে থাকে একের পর এক কবির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে ইরানি এসব কবি আজও মর্যাদার আসনে আসীন। বিশ্বখ্যাত মহাকবি ফেরদৌসের *শাহনামা* আজও বিখ্যাত। ৬০,০০০ শ্লোকের এ মহাকাব্যকে ফারসি সাহিত্যে সবচেয়ে উঁচুমানের সাহিত্যকর্ম হিসেবে মনে করা হয়। তার মহাকাব্যে তিনি আরবি শব্দ ব্যবহার করেননি বিধায় ফারসি রচনার মধ্যে এটিকে প্রধান রচনা হিসেবে মনে করা হয়, যেখানে পুরোপুরি ফারসি শব্দশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে।

এ-সময় সুফিবাদের ওপর কবিতা রচনা করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন কবি রুমি। রুমিকে ইসলামের সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন 'সুফিবাদি' কবি এবং তিনি ছিলেন ফারসি সুফিবাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। রুমি ছিলেন উচ্চমার্গের স্বীকৃত সুফি। তিনি সুফিবাদকে ভালোবাসতেন এবং জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি উপভোগ করেছিলেন। তিনি সবার কাছে 'মাওলানা বা আমাদের প্রভু' (Our Master) নামে খ্যাত ছিলেন। মোঙ্গল অভিযান ও ধ্বংসযজ্ঞের সময়ে তিনি বাস করলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কুরআন, ইসলাম, শিক্ষকদের সান্নিধ্য উপভোগ ও ভ্রমণ করে অতিবাহিত করেন। সাদিকে ফারসিতে সবচেয়ে বড় কবি বলা হয়। তাঁর কথাবার্তার নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ ছিল। গদ্য ও কবিতায় তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। এ-সময়ে হাফিজ নামে আরেকজন কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গজলের কবি হিসেবে মনে করা হয়। ইরানের সব কবির মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি যিনি কাব্যিক কৌশলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিলেন।

পনেরো শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বসবাসরত মুসলিমদের ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্য দিয়ে উর্দু নামে নতুন একটি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়।

ভারতীয় আর্য (সংস্কৃত) ভাষার মধ্য দিয়ে এর বিস্তার ঘটে। এ দু'ভাষার মাধ্যমে ভারতের মুঘলরা তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ফারসি ভাষাও প্রভাবান্বিত হয়। ইসলামী ঐতিহ্য ও শিল্পকলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এক অনবদ্য অবদান রাখে। ■

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিল্পকলা

কর্ডোভার বিশাল আকারের মসজিদ আর গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদ স্পেনের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ; যা ইসলামী শিল্পকলার বিরাট উদাহরণ হয়ে আছে। এসব অট্টালিকা উজ্জ্বল, রঙিন, মনোমুগ্ধকর, আরবীয় শৈল্পিক কারুকার্যখচিত (Arabesque), সুন্দর হস্তলিপিযুক্ত এবং জ্যামিতিক নকশায় সুসজ্জিত। কুরআনের অনেক জায়গায় সৌন্দর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৪১] মুসলিমরা আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেছেন। তারা কুরআন ও তাদের মসজিদগৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন; এগুলোতে তারা দৃষ্টিনন্দন অদ্বিতীয় ইসলামী নকশা করেছেন। আজকাল মুসলিম বিশ্বে সুন্দর নকশা, অলঙ্করণ, সুন্দর হস্তলিপি, গ্রন্থের অলঙ্করণ, ক্ষুদ্রাকৃতির পেইন্টিং এবং সুশোভিত পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। জ্যামিতিক নকশার মধ্যে আরবি শিল্পখচিত নকশায় ইসলামের সবচেয়ে নান্দনিক শিল্পসমৃদ্ধ কাজ এখনো মুসলিম বিশ্বে দেখা যায়।

মুসলিমরা ইসলামপূর্ব যুগ হতেই হাতের কাজ বিশেষ করে কার্পেটে কারুকাজ করে আসছিলেন। এখনো এগুলো সর্বত্র বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। মসজিদের অভ্যন্তর কার্পেটে সজ্জিত করা হয়। যাযাবররা তাদের সফরে এগুলো বহন করত। মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জায়নামাজের কার্পেট। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় মুসলিম বিশ্বের কার্পেটেরই সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল। কার্পেটের উন্নত নকশার জন্য এগুলো বিশ্বে সমাদৃত ছিল। নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয় শিল্পীদের পেইন্টিংয়ের অংশ হিসেবেও মুসলিম বিশ্বের কার্পেটের কারুকার্য সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

সিরামিক ও কাচ শিল্পে মুসলিমরা চকচক করার পদ্ধতি পুনরাবিষ্কার করে। এ শিল্প ইউরোপে চালু করা হলে এটি পশ্চিমা মৃৎপাত্র শিল্পে (Pottery) আধিপত্য বিস্তার করে। মুসলিমরা ঔজ্জ্বল্য বিকাশে এবং বহু রং মিশ্রিত কাচের জন্য ধাতু মিশ্রিত চকচক করার কৌশল ব্যবহার করে।

চাকচিক্যকরণের মুসলিম কৌশল স্পেন ও ইতালি হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। ইতালি তিন শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে গির্জা সাজানোর জন্য চকচকে মৃৎপাত্র ও সিরামিক কিনেছে। মুসলিম বিশ্বে মধ্যযুগে এটিই ছিল একমাত্র সভ্যতা, যেখানে কাচ ও উচ্চ শিল্পসমৃদ্ধ ক্রিস্টাল পাথরের কাজ হতো। গ্লাস বা কাচ সাজসজ্জাকরণে ও সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োজনের সামগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। স্বর্ণবিহীন বা স্বর্ণমিশ্রিত এনামেলের ব্যবহারও এ-সময়ে দেখা যায়।

রসবোধের সমঝদাররা মুসলিম কলাশিল্পের ইসলামী ক্ষুদ্রাকৃতির পেইন্টিংয়ের সৌকর্যে সবচেয়ে বেশি আনন্দ অনুভব করেন। পারস্য, মুঘল ও তুর্কি পেইন্টিংয়ে এরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ-শিল্পের বিস্তারিত রূপ অত্যন্ত সচেতন ও নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। ক্ষুদ্রাকৃতির পেইন্টিংগুলোর অন্যান্য কলাসংস্কৃতি যেমন– অট্টালিকা, সুন্দর হস্তলিখন, বাগান, কার্পেট ও বস্ত্রসামগ্রিতে পরিলক্ষিত হয়। এগুলো তৈরিতে অনেক সম্পদ ব্যয় হয়ে যায়। উজ্জ্বল রং, স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর ব্যবহারেও অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

ইসলামী যুগের শুরু থেকে সঙ্গীত শিল্প বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি মুসলিম এলাকায় এটি ছিল। হিজাজের যেখানে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেখানেও শিল্প হিসেবে সঙ্গীতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলিমরা 'সুরের কৌশলকে গ্রহণ করতে থাকে'।[৪২] রাসূল সা. কুরআন তিলাওয়াতের সময় সুরের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। প্রথম দিকের মুসলিম সঙ্গীত শুরু হয়েছিল কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের খলিফাদের সময় হতে। এ-সময় উপস্থিত মতো সঙ্গীতের যা পাওয়া যেত তাই গাওয়া হতো। শব্দের চেয়ে স্বরলিপির ওপর তখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। সঙ্গীতের বিষয়টি ছিল স্থানীয় সংস্কৃতির বিষয়, কেউ মানুষের রীতিনীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। সঙ্গীত এভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সঙ্গীতের ওপরও কারো হস্তক্ষেপ ছিল না। এ-সময় ঐতিহ্যবাহী দেশীয় গান, সুর আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে স্থানীয় সঙ্গীতের সুরের প্রচলন ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়।

মুসলিম বিশ্বে স্থাপত্যশিল্পের ন্যায় আরবি হস্তলেখা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা। কুরআন প্রথম দিকে লেখা হতো তির্যকভাবে (Slanting)। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে মক্কা ও মদিনায় কুরআনের লিপির উন্নয়ন সাধিত হয়। এর জন্য শিল্পকলার অংশ হিসেবে হস্তলেখা শিল্পের উদ্ভব ঘটে।[৪৩]

বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের লিপি ব্যবহৃত হতে থাকে। এ-সময় অট্টালিকাগুলোও বিভিন্ন লিপিতে সজ্জিত করা হতো। 'আল্লাহ' লেখাকে বিভিন্ন স্টাইলে ও পদ্ধতিতে ফোকাস করা হতো। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বছরগুলোতে মুসলিম শিল্পীদের কর্মগুলোর শক্তিশালী প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় আরবি শিল্পকলার জ্যামিতিক নকশার উন্নয়নের মধ্যে। ইসলামের অন্যসব কলা-সংস্কৃতি লক্ষ করা যায় মুসলিমদের মসজিদের শিল্পসৌন্দর্যের মধ্যে; এবং বিশেষভাবে হস্তলেখা শিল্প ও আরবি হস্তলেখা শিল্পের মধ্যে।[৪৪] এতে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, স্থাপত্যশিল্প হলো শিল্পকলার অংশবিশেষ। রাসূল সা.-এর মদিনার মসজিদ হলো ইবাদত বন্দেগির জন্য সব ভবনের সৌন্দর্যতম একটি স্থাপত্য বিশেষ। মিনার ও গম্বুজের মধ্য দিয়ে মদিনার মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। ■

চতুর্দশ অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতায় অটোম্যানদের অবদান

তুর্কি অটোম্যানরা শেষের দিকে ইসলামী সভ্যতার গঠন ও বিকাশে বিশেষ করে ইসলামী শিল্পকলায় ও স্থাপত্যশিল্পে তাদের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। অটোম্যান স্টাইলের মধ্যে বাইজান্টাইন ও ইউরোপীয় রেনেসাঁর পারস্পরিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম তুর্কি আমিরাত ইসলামী উদ্ভাবন ও স্থাপত্যের মধ্যে অনেকগুলো নতুন বৈশিষ্ট্যও আমদানি করেছিলেন। তারা মুসলিম বিশ্বে এক অদ্ভূত ধরনের নতুন মিনার স্থাপত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলো প্রাথমিক যুগের ইসলামী আয়তাকার (Rectangular) মিনারের চেয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল। ঘনক্ষেত্রের (Cubic) আয়তনবিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভের আকারে গম্বুজের সমন্বয়ে গঠিত মিনার ছিল একটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। মধ্য-এশিয়ায় অটোম্যানদের বসবাসের সময় তুর্কিরা গম্বুজসদৃশ তাবুতে বসবাস করতেন যেগুলো পরবর্তীতে তুর্কি স্থাপত্য ও আলঙ্কারিক শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছিল। সেলজুক (Seljuk) আমলে গম্বুজকে প্রধান স্থাপত্য হিসেবে দৃঢ়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া পারিপার্শ্বিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে ভবন নির্মাণে কল্পনার সাথে ঐক্যের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। শৈল্পিক সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে গঠিত বিষয়টি ছিল অটোম্যান তুর্কিদের অনবদ্য অবদান। তাদের ভাষা তুর্কি হলেও সমৃদ্ধশালী ফারসি ও কাব্যিক মাধুর্যসমৃদ্ধ আরবি ভাষা ও শব্দাবলির মাধ্যমে এটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য মসজিদ নির্মাণে বিশেষ দৃষ্টি দান করে। এ-কারণে মসজিদ সবসময় অটোম্যান রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল নগরীর পতনের ফলে অটোম্যান শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের ওপর বাইজান্টাইন প্রভাব গভীরভাবে পড়তে শুরু করে। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ও মহৎ সুলায়মানের সময়েই এ-প্রভাব অনুভূত হয়। এছাড়াও পূর্ব থেকে বিদ্যমান বহু ধর্মীয় ও অধর্মীয় অট্টালিকা, বিশেষ করে হায়া সোফিয়া (Hagia Sophia) মসজিদের ন্যায় অট্টালিকাও এর সাথে যুক্ত ছিল। হায়া

সোফিয়া গির্জাটি অটোম্যানরা পেয়েছিলেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে। বাইজান্টাইন বিজয়ের পর গির্জাটিকে একটি রাজকীয় মসজিদে রূপান্তর করা হয়। এটি অটোম্যান স্থপতিদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত গম্বুজবিশিষ্ট পবিত্র স্থানের উপস্থিতি ইতালি ও অটোম্যান সাম্রাজ্যে দেখা যায়। রোমান বাইজান্টাইন স্থাপত্য ঐতিহ্যের কিছু অংশের পুনরাবির্ভাবের বিষয়টিও এখানে দেখা যায়।

বিশ্বশক্তি হিসেবে অটোম্যানরা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনটি মহাদেশে ব্যাপ্তি লাভ করে। মুক্ত বিশ্ববাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদানে তারা ছিল অগ্রদূত। ইউরোপীয় পুঁজিবাদের পত্তনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অটোম্যান মানচিত্র নির্মাতা ও লেখকগণ ইউরোপীয় রেনেসাঁর মানচিত্র নির্মাতাদের ন্যায় একই সূত্র ব্যবহার করত। সনাতন প্রাচীন নিদর্শনজাতীয় কর্মগুলোর মধ্যে পোতলেমির ভূগোলের[৪৫] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনেক দিক থেকে অটোম্যান সাম্রাজ্য ছিল আগেরকার ভূমধ্যসাগর এলাকার বাইজান্টাইন ও রোমান সাম্রাজ্যের একটি মুসলিম উত্তরসূরি। এ-হিসেবে অটোম্যানরা তাদের নিজেদেরকে রোমান ও মুসলিম ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসেবে মনে করতেন। আব্বাসীয় খেলাফতের বেলায়ও একই অবস্থা, এখানে অটোম্যান নগররাষ্ট্রে ছিল জনহিতৈষী আর বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। জোয়ার (Millet) পদ্ধতি (এক ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা) ধর্মীয় অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যকে আধা-স্বায়ত্বশাসিত সমাজে বিভক্ত করেছিল। স্থাপত্যশিল্পে মসজিদ ও কলেজ নির্মাণের ওপর অটোম্যানদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা[৪৬] ও দায়িত্ববোধ লক্ষ্যণীয় ছিল। ইসলামের প্রতি তাদের অনুপম বন্ধন সবসময়ই বিদ্যমান ছিল। শিল্পকলার প্রতি তাদের পছন্দ ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অটোম্যানরা জুলুমবাজদের কাছ থেকে এবং ইসলামের কাছ থেকে রাজনৈতিক ঐতিহ্যের একটি শক্তিশালী মিশ্রণ পেয়েছিল। তুর্কি-ফারসি ও ইসলামী ইতিহাসে প্রাপ্ত ন্যায়বান শাসক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সুলতানের প্রাথমিক কাজ ছিল জনগণকে সরকারের ট্যাক্স ও দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করা। ফলে অটোম্যানদের সহিষ্ণুতাকে ইস্তাম্বুলে বসতি স্থাপনকারী স্পেনের বিশাল ইহুদি জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৪৭] এরূপ সাংস্কৃতিক বন্ধন অটোম্যানদেরকে ইউরোপীয় রেনেসাঁয় প্রভাব বিস্তার করতে এবং প্রভাবিত হতে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পীসুলভ ভাববিনিময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রেনেসাঁর ওপর ইসলামের প্রভাব

ইউরোপীয়রা যারা সবচেয়ে বেশি চেয়েছিল ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করতে তারাই ইসলামী সভ্যতা থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছিল, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে। অধিকন্তু, মোঙ্গলরা– যারা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করেছিল এবং যাদের সাহায্যে ক্রুসেডাররা ইসলামকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং আরো কয়েক শতাব্দীর জন্য ইসলামী সভ্যতাকে প্রসারিত করেছিল। মুঘল ভারত অর্থাৎ আরেক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টিতে মোঙ্গলরা দায়ী ছিল। সাফাভিদ ইরান আর অটোম্যান তুর্কিরা ইউরোপীয় উপনিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতাকে জীবিত রেখেছিল।

ইউরোপে ইসলামী সমাজ জোরালোভাবে বিজ্ঞান, ওষুধশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপে ডাক্তারি পেশা চলত ব্যাপকভাবে ইসলামী মেডিসিন এবং ইহুদি ও মুসলিম ডাক্তারদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। পশ্চিমা ওষুধশাস্ত্র বহু শতাব্দী ধরে ইসলামী মেডিসিনেরই ধারাবাহিকতা ছাড়া কিছু নয়। মুসলিম বিশ্ব থেকে মেডিসিনের জ্ঞান অর্জনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অস্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও এটিই ছিল বাস্তবতা। ইংরেজিভাষী বিশ্বে চসার (Chaucer) ও শেক্সপিয়ারের মাধ্যমে ইসলামী চিকিৎসা সাহিত্যিক অনুমোদন লাভ করে।

মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পেন আর ইতালির শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রবেশ করে। শিক্ষাদীক্ষার ধারণা প্রবেশ করে ক্রুসেডের সময়ে আর ভাষান্তরিত দলিলপত্রের মাধ্যমে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ইসলামী সভ্যতা থেকে ইউরোপীয় গ্রিকরা দর্শনশাস্ত্র পেয়েছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতদের মন্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা তাদের ধ্যান-ধারণার অংশ হিসেবে দর্শন ও মেডিসিনের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক স্থাপন

করেছিল। রেনেসাঁ ও সংস্কারের আগ পর্যন্ত বিশ্বে সম্ভবত বেশি অনূদিত ভাষা ছিল আরবি।

ইসলামী জ্ঞানের বেশিরভাগই মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে। শত শত বছর ধরে স্পেনকে একটি দেশের চেয়ে বেশি মনে করা হতো। অনেক অমুসলিমই এ-সময় মুসলিম নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি ধারণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনে আরবি ভাষাও ব্যবহার করতেন। মুসলিম, ইহুদি এবং চার্লিম্যাগনিসহ (Charlemagne) খ্রিষ্টান ছাত্ররা অধ্যয়নের জন্য স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেত।

ইসলামের আবির্ভাবের ৫০০ বছর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় আরবি গ্রন্থসমূহের অনুবাদ শুরু হয়। জনপ্রিয় সাহিত্যগুলো এ-সময় অনুবাদ হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, মেডিসিন ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থগুলো বেশি পরিমাণে অনুবাদ করা হয়। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে আরবি বিজ্ঞান (Arabic Science) ও দর্শনশাস্ত্র ইউরোপে পৌঁছে যায়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে খ্রিষ্টান ইউরোপ মেনে নিতে পারেনি। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে গ্রিকদের অবদান বলে মনে করত।

দার্শনিক আল-ফারাবি জ্ঞান বিস্তারে পশ্চিমাদের সাহায্য করেছিলেন। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা দর্শনের জটিল বিষয়গুলো বুঝার জন্য তার গ্রন্থের সাহায্য নিত।[৪৮] পশ্চিমা দর্শনে আল-ফারাবির প্রভাব ছিল ব্যাপক, যেমন ছিল খ্রিষ্টান ধর্মে ইসলামের প্রভাব। কুরআনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত তার গ্রন্থগুলো আলবারটাস (Albertus) ও টমাস একুইনো (Thomas Aquinas) উভয়কে প্রভাবিত করেছিল। তার কর্মগুলো এরিস্টটল আর খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে ইসলামী দর্শনের সমন্বয় সাধনে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৪৯]

সাহিত্য ছিল পশ্চিমে ইসলামী সভ্যতার প্রভাবের একটি প্রধান ক্ষেত্র। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর সময় আরবি সাহিত্য ছিল খ্রিষ্টান বিশ্বের ওপর বাইরে থেকে প্রভাব বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র। এছাড়াও, ইসলামের প্রথম সহস্র বছরের মধ্যে আরবি সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। এরপর ক্রুসেড ও এর পরবর্তী সময়ে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত পশ্চিমা ভ্রান্তিগুলো এখানে দৃশ্যমান হয়। ক্রুসেডের সময়ে ব্যর্থ হয়ে খ্রিষ্টানরা মিত্র হিসেবে মোঙ্গলদেরকে নিয়ে মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস

করে বিশ্ব থেকে ইসলামকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। এরপরও পশ্চিমা বিশ্বসহ সব সভ্যতাই ইসলামী সভ্যতার অবদান থেকে উপকৃত হয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর ইসলাম বিশাল সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এসব কারণে, আরবি থেকে ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদসহ পশ্চিমারা মুসলিমদের কাছ থেকে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার লাভ করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা অতিরিক্ত হিসেবে বা প্রাচীন গ্রিক ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানশাস্ত্রের বাহক হিসেবে এগুলোকে পেয়েছিল। আর আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশে রেনেসাঁ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ■

তথ্যনির্দেশ

১. J. M. Roberts, *The Penguin History of the World* (Harmondsworth, Middx, UK: Penguin Books, 1980), p. 378.

২. Ibid., p. 62.

৩. Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant* (Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1970), p. 70.

৪. *Qur'an* 3:13, 2:118, 2:269, 31:20.

৫. J. M. Roberts, *The Penguin History of the World*, p. 394.

৬. *Qur'an* 38:71-72.

৭. *Qur'an* 2:241.

৮. *Qur'an* 2:233.

৯. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture*, 3 vols. (Chicago, IL, & London, 1974), vol. 1, p. 182.

১০. Paul Johnson, *Civilizations of the Holy Land* (New York: Atheneum, 1979), pp. 169-170.

১১. Johnson, *Civilizations*, p. 170. Also Abba Eban, *Heritage: Civilization and the Jews* (New York: Summit Books, 1984), p. 127.

১২. Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*, 9th edn. (London: Macmillan; & New York: St. Martin's Press, 1968), pp. 619-620.

১৩. Philip K. Hitti, *Capital Cities of Islam* (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1973), pp. 510-512.

১৪. Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1991), pp. 46-47.

১৫. Bernard Lewis, *Islam and the West* (New York, and Oxford, UK: Oxford University Press, 1993), p. 12.

১৬. Richard Bulliet, *Conversion to Islam in the Medieval Period* (Cambridge, MA; and London: Harvard University Press, 1979), pp. 33, 34, 37, 44, 82, 97, 109 & 124.

১৭. Philip Curtin, *Cross-Cultural Trade in World History* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1984), p. 107.

১৮. Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*, p. 299.

১৯. Ibid, p. 609.

২০. Sayyid Fayyez Mahmud, *A Short History of Islam* (Karachi, Pakistan: Oxford University Press, 1960), p. 209.

২১. *Qur'an* 106:2.

২২. *The New York Times*, March 16, 1993.

২৩. Andrew M. Watson, *Agricultural Innovation in the Early Islamic World* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), p. 2.

২৪. Janet L. Abu-Lughod, *Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350* (New York, & Oxford, UK: Oxford University Press, 1989), p. 43. Also, Andrew M. Watson, *Agricultural Innovation in the Early Islamic World*, p. 22.

২৫. A. M. A. Shustery, *Outlines of Islamic Culture* (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammd Ashraf, 1976), p. 325.

২৬. Arnold Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 1961), vol.10, pp. 64-86, vol.9, pp. 175-182.

২৭. *Qur'an* 21:30, 24:45, 25:53-54, 34:9, 41:11.

২৮. *Qur'an* 25:2, 54:49 and other verses.

২৯. Colin A. Ronan, *Science: Its History and Development Among the World's Cultures* (New York: Facts on File Publications, 1982), p. 203.

৩০. J. Casulleras and J. Samso (eds.), *From Baghdad to Barcelona: Studies in the Islamic Exact Sciences in Honour of Prof. Juan Vernet*, 2 vols. (Barcelona: Barcelona University, 1996), vol. 1, p. 479.

৩১. Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society* (London & New York: Routledge, 1988), pp. 238-346.

৩২. George Sarton, *Introduction to the History of Science*, 3 vols. Vol.1, *From Homer to Omar Khayyam* (Baltimore, MD: Williams & Wilkins for the Carnegie Institute of Washington, 1927; repr. 1962), p. 666.

৩৩. Edward G. Browne, *Arabian Medicine* (Lahore, Pakistan: Hijra International Publishers, 1990), p. 48.

৩৪. Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*, p. 221.

৩৫. Reynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1966), p. 323.

৩৬. Bernard Lewis, *Islam and the West* (New York, and Oxford, UK: Oxford University Press, 1993), pp. 120-121.

৩৭. Salma Khadra Jayyusi (ed.), *The Legacy of Muslim Spain* (Leiden, The Netherlands; New York; Cologne: E.J. Brill, 1992), pp. 387-396.

৩৮. H. T. Norris “Fables and Legends,” in Julia Ashtiany, T. Johnstone, J. Latham, R. Serjeant, and G. Rex Smith (eds.), *The Cambridge History of Arabic Literature: Abbasid Belles-Lettres* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990), pp. 137-138.

৩৯. Reynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1966), pp. 429-430.

৪০. Manoochehr Aryanpur, *A History of Persian Literature* (Tehran: Kayhan Press, 1973), Pp. 70, 72, 73.

৪১. *Qur'an* 7:31-32, 16:8, 16:13, 50:7.

৪২. '*Handasah al-Sawt*' or '*the art of sound*'.

৪৩. Giovanni Curatola, *The Simon and Schuster Book of Oriental Carpets*, trans. Simon Pleasance (New York: Simon and Schuster, 1981), pp. 28-30.

৪৪. Ibid., p. 28.

৪৫. Halil Inalcik and Cemal Kafadar, eds., *Suleyman the Second and His Time* (Istanbul: Isis Press, 1993), p. 348.

৪৬. Avigdor Levy, *Jews, Turks, Ottomans: A Shared History, Fifteenth through the Twentieth Century* (Syracuse University Press, 2003).

৪৭. Ibid.

৪৮. Muhsin Mahdi, 'Islamic Philosophy', in *The New Encyclopaedia Britannica, Macropedia*, (Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica Inc., 1987), vol .22, pp. 24-25.

৪৯. Eugene A. Myers, *Arabic Thought and the Western World* (New York: Frederick Ungar Publishing, 1964), p. 30.

গ্রন্থ পরিচিতি

'ইসলামী সভ্যতায় অধ্যয়ন: রেনেসাঁয় মুসলিম অবদান' শীর্ষক গ্রন্থটি আহমেদ ঈসা এবং ওসমান আলি রচিত *Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance* গ্রন্থের Book-In-Brief এর বঙ্গানুবাদ।

এ গ্রন্থ পাঠে ধারণা পাওয়া যায় যে, মুসলিম স্কলারদের ব্যাপক অবদান ছাড়া ইউরোপে রেনেসাঁ সম্ভব হতো না। প্রায় হাজার বছর ধরে বিশ্বসভ্যতায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল ইসলাম; যার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ছিল অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে বিশাল।

মুসলিম স্কলারগণই ইউরোপে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে শাণিত করেছিলেন এবং সাতশত বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপের ভাষাকে আরবী ভাষার মাধ্যমে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন।

এ গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসের সেই 'সোনালি যুগ'কে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে- পশ্চিমা সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির মডেল নয় বরং মুসলমানরাই ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-প্রযুক্তি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য-শিল্পকলায় উন্নতির মাধ্যমে উন্নত ও আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি গড়েছিল। ইসলামী রেনেসাঁর উদ্ভব হয়েছিল বলেই প্রকৃত প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি

ড. আহমেদ ঈসা ১৯৬৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রেনো'র ইউনিভার্সিটি অব নেভাডা এর অধ্যাপক হিসেবে বহুসংস্কৃতি সাহিত্য এবং সৃজনশীল লেখা পাঠদান করতেন। তিনি আফ্রিকান ও মধ্যপ্রাচ্য সাহিত্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভারতে জন্মগ্রহণকারী ড. ঈসা দক্ষিণ আফ্রিকার পিটারমারিটজবার্গ ও ডারবানে শৈশবের বছরগুলি কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবল বর্ণবাদী পরিবেশে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাকে সৃজনশীল লেখালেখির জন্য অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তিনি নর্দার্ন নেভাদা মুসলিম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'নেভাদা ও এর সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় অধিবাসিগণকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের সাথে সংযুক্ত করার জন্য' ২০০৩ সালে নর্দার্ন নেভাদা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার তাকে বিশ্ব নাগরিক পুরস্কার প্রদান করে। ২০০৮ সালের ১৫ জুন তার ইন্তেকালের পর ইসলামিক সভ্যতার গবেষণা সংক্রান্ত রচনার চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি করেন ড. ওসমান আলী।

ড. ওসমান আলি মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের একজন কানাডিয়ান অধ্যাপক। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন। তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং ইউনিভার্সিটি অব গুয়েলফ, কানাডা থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ড. আলি ১৯৯৪-৯৮ সাল পর্যন্ত টরন্টো'র ইউনিভার্সিটি অব রায়ারসেন এর ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বর্তমানে ইরাকের ইরবিলে ইউনিভার্সিটি অব সালাহাদ্দিন এর ইতিহাস বিভাগে শিক্ষাদান করেন। তিনি ইরাকের ইরবিল-কুর্দিস্তান অঞ্চলের কুর্দিশ-তুর্কিশ স্টাডিজ সেন্টারের সভাপতি এবং কুর্দি ইতিহাস ও রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ রয়েছে।

ISBN: 978-984-96731-7-0